ইসলামী ইশতেহার

খিলাফত: দেশের জন্য একমাত্র সঠিক নেতৃত্ব ও সরকার ব্যবস্থা

সূচিপত্র

পটভূমি **০৫**

অধ্যায় ১ঃ শাসন ব্যবস্থা (Ruling System) **০৭**

১.১ *বাংলাদেশের বর্তমান শাসন ব্যবস্থার মূলনীতি*
১.২ *খিলাফত শাসন ব্যবস্থার মূলনীতি*
১.৩ *খিলাফত সরকারের কাঠামো*

অধ্যায় ২ঃ মৌলিক নাগরিক অধিকার (Basic Rights) **১২**

২.১ *মৌলিক চাহিদা পূরণে খলীফার বাধ্যবাধকতা*
২.২ *মৌলিক চাহিদা পূরণে পদক্ষেপসমূহ*
২.৩ *জনগণের নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকার*
২.৩ *জনগণের নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকার*
২.৪ *শিক্ষার অধিকার*
২.৫ *নারীর অধিকার*
২.৬ *অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার*
২.৭ *নাগরিকদের অন্যান্য অধিকার*

অধ্যায় ৩ঃ স্বনির্ভরশীল অর্থনীতি (Self-Reliant Economy) **২৪**

৩.১ *শিল্পায়ন*
৩.২ *জ্বালানী সম্পদ ব্যবস্থাপনা*
৩.৩ *কৃষি*
৩.৪ *অর্থ ব্যবস্থাপনা*
৩.৫ *বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত অর্থনীতি*

অধ্যায় ৪ঃ পররাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা (Foreign Policy and Security of the State) **৩২**

৪.১ *মূলনীতি*
৪.২ *সশস্ত্রবাহিনীর শক্তিশালীকরণ*
৪.৩ *প্রতিরক্ষা শিল্পকেন্দ্রীক অর্থনীতি*
৪.৪ *প্রযুক্তি*
৪.৫ *সিটিজেন'স আর্মি*
৪.৬ *কূটনৈতিক তৎপরতা*
৪.৭ *আন্তর্জাতিক চুক্তি*

পটভূমি

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বর্তমান রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা দেশবাসীর কোন প্রত্যাশার বাস্তবায়ন করতে পারেনি। এদেশের মজলুম, নিপীড়িত, অধিকার বঞ্চিত মানুষ তাদের মৌলিক সমস্যার সমাধান চায়। প্রচলিত শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে বিকল্প শাসন ব্যবস্থা চায়। দেশের লক্ষ কোটি মানুষের মৌলিক বিশ্বাস তথা ইসলামী আকীদা থেকে উৎসারিত শাসনব্যবস্থা খিলাফত সরকার জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারবে, দেশের অর্থনীতিকে সাম্রাজ্যবাদীদের দখলমুক্ত করবে এবং সকল মানুষের যাবতীয় মৌলিক অধিকার ও জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। খিলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থায়:

১. জনগণ তাদের পছন্দ মত সরকারপ্রধান (খলীফা) নির্বাচন করতে পারবে।

২. খলীফা কুরআন-সুন্নাহ্‌ দ্বারা জনগণকে শাসন করতে বাধ্য এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে দায়বদ্ধ। যার ফলে রাজনীতিবিদ ও শাসকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে এবং ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা দলীয় স্বার্থে কেউ রাজনীতি করার সুযোগ পাবেনা।

৩. মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা খলীফার দায়িত্ব। খলীফা কুরআন-সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে দেশ পরিচালনা ও জনগণের অধিকার নিশ্চিত করছেন কিনা, সে ব্যাপারে মুসলিম ও অমুসলিম সকল নাগরিকের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য।

৪. খলীফা দেশের সম্পদ ও অর্থনীতিকে বিদেশীদের হাতে তুলে দিতে পারবেন না কারণ জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে খিলাফতকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার নীতি অবলম্বন করতে খলীফা কুরআন-সুন্নাহ্‌ দ্বারা বাধ্য।

৫. খলীফা বা রাজনীতিবিদরা টাকা ও ক্ষমতার মোহে সাম্রাজ্যবাদীদের সামনে নতজানু হবেন না। বরং ইসলামী রাষ্ট্র যেন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রভাব বিস্তার করতে পারে সে লক্ষ্যে কাজ করবেন। সুতরাং খলীফা জাতীয় রাজনীতিতে বিদেশীদের হস্তক্ষেপ কখনো মেনে নেবেন না এবং দেশের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়, এমন কোন কর্মকান্ড অনুমোদন করবেন না।

৬. খলীফা মুসলিম বিশ্বকে একীভূত করবেন যাতে মানবসম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভৌগোলিক অবস্থানের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে। ঐক্যবদ্ধ মুসলিম বিশ্ব তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং উদীয়মান শক্তি ভারত, চীন ও রাশিয়ার সাথে সফলভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে।

বর্তমান শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির প্রতারণা-বঞ্চনা-জুলুম-অবিচার থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় ইসলামী শাসন তথা খিলাফত সরকার। এই প্রেক্ষাপটে খিলাফত সরকারের দাবি তোলার এখনই উপযুক্ত সময়। খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সকল মুসলিমের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। আলাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন,

*"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ। তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার তোমার উপর ন্যস্ত করে।" [**সূরা নিসা : ৬৫**]*

"হে ঈমানদারগণ, যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এমন কোন কিছুর দিকে তোমাদেরকে আহ্বান করেন যা তোমাদের মধ্যে জীবনের সঞ্চার করে তখন সেই আহ্বানে সাড়া দাও।" [সূরা আনফাল : ২৪]

বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতিতে স্থায়ী ও মৌলিক পরিবর্তনের লক্ষ্যেই হিযবুত তাহ্রীর, বাংলাদেশ জাতির সামনে এই ইসলামী ইশতেহার উপস্থাপন করছে। কুরআন সুন্নাহ্ এই ইশতেহারের ভিত্তি। এর ফলে দেশবাসী ইশতেহারের যৌক্তিকতা যেমন অনুধাবন করতে পারবে তেমনি নিশ্চিত বিশ্বাস সহকারে বলিষ্ঠতার সাথে রাজপথের আন্দোলনে যোগ দিত এগিয়ে আসবে।

হিযবুত তাহ্রীর, বাংলাদেশ

২৯ রবিউস সানি, ১৪৩০ খ্রিষ্টাব্দ
২৬ এপ্রিল, ২০০৯ হিজরী

অধ্যায় ১: শাসন ব্যবস্থা (Ruling System)

বিগত ৩৭ বছর দেশের মানুষ গণতান্ত্রিক, স্বৈরতান্ত্রিক, সামরিক ও জরুরী অবস্থার শাসন দেখেছে। ভিন্ন ভিন্ন নামে এগুলো সবই প্রকৃতপক্ষে একই ধরণের শাসন ব্যবস্থা – কেননা এসবগুলোই সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে ধার করা এবং এই ব্যবস্থাগুলো কখনই সঠিক নেতৃত্ব ও সরকার ব্যবস্থা তৈরি করতে পারেনি। একমাত্র খিলাফত ব্যবস্থাই সঠিক নেতৃত্বকে ক্ষমতায় আসীন করতে পারে, যে নেতৃত্ব হবে জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল এবং বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর দুর্নীতির ভাগীদার নয় বা এই শাসকগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত কেউও নয়। এই নেতৃত্ব দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে; ওয়াশিংটন, লন্ডন আর দিল্লীর পদসেবা করবেনা; ঔপনিবেশিক আমলের পরাজিত মানসিকতার অধিকারী হবেনা এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশকে শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যাবে। শুধুমাত্র খিলাফত ব্যবস্থাই একটি শক্তিশালী ও স্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করবে, যা বাংলাদেশের মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করবে, আত্মনির্ভরশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠন করবে এবং জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

১.১ বাংলাদেশের বর্তমান শাসন ব্যবস্থার মূলনীতি

মানুষের সার্বভৌমত্ব ও স্বেচ্ছাচারিতা এই শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে সীমাবদ্ধ আর এই ক্ষমতাবানরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। তারা ইচ্ছামত নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে আইন তৈরী করতে পারে অথচ নিজেরা থাকে সকল আইনের উর্ধ্বে। বর্তমান শাসকগোষ্ঠী জনগণের দায়িত্ব কাঁধে নেয়না। তারা ক্ষমতার রাজনীতিতে নিজেদের অবস্থান শক্ত করার জন্য এবং জাতিকে দরিদ্র করে হলেও নিজেদের পকেট ভর্তি করতে সবসময় ব্যস্ত। এই শাসন ব্যবস্থায় শাসকদেরকে কারো কাছে কোন জবাবদিহি করতে হয়না। কারো কাছে তারা দায়বদ্ধ নয়। অর্থাৎ তাদের অবাধ ও নিরংকুশ ক্ষমতা আছে কিন্তু কোন দায়বদ্ধতা নেই।

১.২ খিলাফত শাসন ব্যবস্থার মূলনীতি

আলাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা মানুষ ও বিশ্বজগৎ সৃষ্টির সাথে সাথে মানুষকে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য দিয়েছেন খিলাফত শাসন ব্যবস্থা। ইসলামী শাসন ব্যবস্থার প্রধানতম মূলনীতি হচ্ছে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা। অর্থাৎ তিনিই একমাত্র আইন প্রণেতা। আলাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেছেন:

“আল্লাহ্ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না।” [সূরা ইউসূফ : ৪০]

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান (খলীফা, যিনি রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী তথা একই সাথে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান) নিজে কোন আইন তৈরী করতে পারবেন না। তাই তাঁর স্বেচ্ছাচারী ও স্বৈরাচারী হবার কোন সুযোগ নেই। ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা মানুষের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে বাধ্য। তিনি মানুষের মৌলিক চাহিদা অবশ্যই পূরণ করবেন। মৌলিক চাহিদা পূরণের পরেই অন্যান্য চাহিদা পূরণের দিকে রাষ্ট্র নজর দিবে।

ইমাম (খলীফা) যিনি সর্বসাধারণের উপর শাসক হিসেবে নিয়োজিত তিনিও দায়িত্বশীল, তাকেও তার দায়িত্ব সম্বন্ধে জবাবদিহি করতে হবে। রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ

"সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্বন্ধে জবাবদিহি করতে হবে।"

খলীফা তার নিজের কাজের জন্য আল্লাহ্'র কাছে এবং জনগণ তথা মুসলিম ও অমুসলিম সকল নাগরিকের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। রাসূল (সাঃ) বলেছেন:

"যাকে আলাহ্ তা'আলা প্রজাদের উপর শাসক বানিয়েছেন সে যদি তাদের পূর্ণাঙ্গভাবে কল্যাণ কামনা না করে, তবে জান্নাতের ঘ্রাণও তার নসিব হবে না।"

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে খিলাফত শাসনব্যবস্থা চারটি মূলনীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হবেঃ

১. ইসলামী আকীদাই হবে রাষ্ট্রের একমাত্র ভিত্তি। সকল রাষ্ট্রীয় কার্যক্ম ইসলামী আকীদা ও ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে।

২. মানুষের স্বেচ্ছাচারী আইন তৈরীর ক্ষমতা রহিত করা হবে এবং কুরআন-সুন্নাহ্ আইন তৈরীর একমাত্র ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হবে ।

৩. ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য জনগণ তাদের পছন্দ অনুযায়ী একজন খলীফা নির্বাচন করবেন। খলীফা হবেন রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী তথা একই সাথে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান।

৪. খলীফা কুরআন ও সুন্নাহ্র ভিত্তিতে দেশ পরিচালনা করতে, জনগণের সার্বিক দায়িত্ব নিতে, জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে এবং শাসনকার্য পরিচালনায় স্বচ্ছ নীতি অবলম্বন করতে বাধ্য।

১.৩ খিলাফত সরকারের কাঠামো

খিলাফত সরকারের কাঠামো আটটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিতঃ

১. খলীফা (রাষ্ট্রপ্রধান)

২. খলীফার বিশেষ প্রতিনিধি (Deputies of the Khaleefah)

৩. নির্বাহী সহযোগী (Executive Assistants of the Khaleefah)

৪. আমীরে জিহাদ

৫. প্রধান বিচারপতি ও বিচার বিভাগ

৬. গভর্নর

৭. প্রশাসনিক বিভাগ

৮. মজলিসে শুরা (জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী পরামর্শ সভা)

- **খলীফা নির্বাচন**

খিলাফত সরকার ব্যবস্থা রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র বা পরিবারতন্ত্র নয়। খলীফা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। তার একমাত্র কাজ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে দেশ পরিচালনা করা, মানুষের দেখাশুনা করা এবং মানুষের সমস্যা সমাধান করা। এটাকে তিনি ইবাদত হিসেবে দেখবেন।

- **খলীফা পদপ্রার্থীর যোগ্যতা**

শুধুমাত্র ইসলামী ব্যক্তিত্ব তথা কুরআন-সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে তৈরী নীতিমালার আলোকে যোগ্য (Competent) ও বিশ্বস্ত (Trustworthy) ব্যক্তিই খলীফা পদপ্রার্থী হতে পারবেন। কালো টাকার মালিক, ক্ষমতার অপব্যবহারকারী ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি কখনই খলীফা পদপ্রার্থী হতে পারবেন না। খলীফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে জনগণের প্রতিনিধি দ্বারা স্বাধীনভাবে প্রার্থী বাছাই সম্পন্ন হবে। পরামর্শ সভা যোগ্যতা যাচাই বাছাই করে খলীফা পদপ্রার্থীদের তালিকা চূড়ান্ত করবেন। নির্বাচন সংণন্ত যেকোন বিরোধ মাহ্‌কামাতুল মাযালিম (Court of Unjust Act) নিষ্পন্ন করবেন। আদালত যেকোন নির্বাচনকে তদন্ত সাপেক্ষে অবৈধ ঘোষণা করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

- **খলীফার শাসনের সময়সীমা**

খলীফা যতদিন কুরআন-সুন্নাহ্ অনুযায়ী জনগণকে শাসন করবেন, ততদিন তিনি এই পদে আসীন থাকবেন। এই প্রণ্ডিয়ায় জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। খলীফা দুর্নীতি-লুটপাট তথা কুরআন-সুন্নাহ্ বিরোধী কোন কাজ করলে পরদিনই তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ব্যবস্থা রয়েছে। আর খলীফা কুরআন-সুন্নাহ্ অনুযায়ী কাজ করলে তাকে সরানোর কোন প্রয়োজন নেই।

- **পরামর্শ সভা**

খলীফাকে পরামর্শ দেয়া, তাঁর কাছে অভিযোগ করা এবং প্রয়োজনে তাঁর কাছ থেকে অধিকার আদায়ের জন্য পরামর্শ সভা গঠন করা হবে। এই পরামর্শ সভা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবে। নারী-পুরুষ, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিক ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন এবং নির্বাচিত হতে পারবেন। পরামর্শ সভার অন্যতম দায়িত্ব হবে খলীফাকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি করা। পরামর্শ সভার যেকোন প্রতিনিধি রাষ্ট্রীয় যেকোন কর্মকর্তা-কর্মচারী সম্পর্কে অভিযোগ আনতে পারেন। অভিযোগ প্রমাণিত হলে খলীফা তাৎক্ষণিকভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পদচ্যুত করতে বাধ্য।

- **স্বাধীন বিচার বিভাগ**

কুরআন-সুন্নাহ্‌র বিধি মোতাবেক বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও স্বাধীন করা হবে। বিচার ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে মাহ্‌কামাতুল মাযালিম (Court of Unjust Act), যেখানে জনগণ ও রাষ্ট্রের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়। এই আদালতে জনগণ খলীফাসহ সকল রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় জুলুমের প্রতিকার এবং অধিকার আদায়ের জন্য মামলা করতে পারবেন। এই আদালতের বিচারক খলীফাসহ যে কোন রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পদচ্যুত করতে পারবেন। খলীফার বিরুদ্ধে মামলা চলাকালীন এই আদালতের বিচারককে পদচ্যুত করা যাবেনা। অভিযোগ ব্যাতিরেকে আদালত স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যেকোন ধরণের জুলুম আমলে আনতে পারবে, তদন্ত ও রায় দিতে পারবে।

- **রাজনীতি**

বর্তমান রাজনীতির ভিত্তি পুঁজিবাদ। ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থ হাসিলই এই রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য। অন্যদিকে খিলাফতের রাজনীতির (সিয়াসাত) উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহ্ অনুযায়ী সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ। কারণ খিলাফতের রাজনীতির ভিত্তি হচ্ছে তাকওয়া (আল্লাহ্’র ভীতি) এবং এই রাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের দেখাশুনা করা। তাই এই রাজনীতিতে দুর্নীতি, কালো টাকা, দলাদলি, পেশীশক্তি, ব্যক্তিস্বার্থ ও বিদেশীদের তাঁবেদারির কোন স্থান নেই।

- **রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব**

ইসলামী রাষ্ট্রে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকতে পারে। এই রাজনৈতিক দলগুলোর

কাজ হবে কুরআন-সুন্নাহ্ অনুযায়ী খলীফা তথা শাসকদেরকে জবাবদিহিতার মুখোমুখী করা। রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য কোন অনুমতিরও প্রয়োজন নেই।

- **স্থানীয় সরকার কাঠামো**

খিলাফত সরকারের স্থানীয় সরকার কাঠামো ছয়টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে:

১. গভর্নর

২. প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভা

৩. জেলা প্রশাসক (Ameel or Hakim)

৪. উপজেলা (Qasabah) সচিব

৫. গ্রাম/ওয়ার্ড (Hayy) পরিচালক

খলীফা গভর্নর ও জেলা প্রশাসক নিয়োগ করবেন, জেলা প্রশাসক উপজেলা সচিব নিয়োগ করবেন এবং উপজেলা সচিব গ্রাম/ওয়ার্ড পরিচালক নিয়োগ করবেন। প্রত্যেক প্রদেশ থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভার সদস্য হবেন। গভর্নর ও প্রাদেশিক প্রশাসনকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি করাই এই প্রতিনিধি সভার দায়িত্ব।

অধ্যায় ২: মৌলিক নাগরিক অধিকার (Basic Rights of the People)

মানুষ সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করে এবং রাষ্ট্র হচ্ছে সমাজ পরিচালনার সাংগঠনিক কাঠামো। রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার অন্যতম মূল কাজ হচ্ছে তার নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা। একথা সবাই নির্দ্বিধায় স্বীকার করবে যে বর্তমান শাসনব্যবস্থা মানুষের মৌলিক অধিকার – খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি প্রদান করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশের সরলপ্রাণ কঠোর পরিশ্রমী জনসাধারণ দারিদ্র বিমোচনের নামে অনেক প্রতিজ্ঞা আর প্রকল্পের ছড়াছড়ি দেখেছে। দুর্নীতিবাজ শাসকগোষ্ঠীর পেট আর পকেট ফুলে ফেঁপে উঠেছে। অথচ জনসাধারণের ভাগ্যের অবনতি ছাড়া ন্যূনতম কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। শুধু তাই নয়, মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা দিতেও বর্তমান শাসনব্যবস্থা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামের বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কেবলমাত্র নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব। এই ক্ষেত্রে খিলাফত সরকার কোন বিষয়গুলো অগ্রাধিকার দিবে আর কোন বিষয়গুলো ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করবে সে সম্পর্কে ইসলাম সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে।

২.১ মৌলিক চাহিদা পূরণে খলীফার বাধ্যবাধকতা

ইসলাম মানুষের চাহিদাগুলোকে সামষ্টিকভাবে না দেখে প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদাগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করে। স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক চাহিদা পূরণ না করে সামগ্রিকভাবে পুরো সমাজের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা ইসলামিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নয়। ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত না করে সবাইকে সমাজ থেকে যেনতেনভাবে তা অর্জন করার জন্য বিচ্ছিন্নভাবে ছেড়ে দেয় না। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা খিলাফত রাষ্ট্রের উপর জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি নাগরিকের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা – এইসব মৌলিক চাহিদা পূরণকে ফরয বা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। সুতরাং খিলাফত রাষ্ট্র সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে জনগণের এসব মৌলিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করবে। অতঃপর তার সামর্থ্যের মধ্যে জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের জন্য পরিবেশ তৈরী করবে।

রাসূল (সাঃ) বলেন, **"বাস করার জন্য একটি গৃহ, আব্রু রক্ষার জন্য এক টুকরা কাপড়, আর খাওয়ার জন্য এক টুকরা রুটি ও একটু পানি এসবের চেয়ে অধিকতর জরুরী কোন অধিকার আদম সন্তানের থাকতে পারে না।" (তিরমিযী)** রাষ্ট্রের নাগরিকের এই মৌলিক চাহিদা পূরণে খলীফা বাধ্য। যদি খলীফা এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন, তবে তার জন্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন রাসূলাল্লাহ (সাঃ)। রাসূল (সাঃ) বলেছেন: **"সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্বন্ধে জবাবদিহি করতে**

হবে।" ইমাম (খলীফা) যিনি সর্বসাধারণের উপর শাসক হিসেবে নিয়োজিত তিনিও দায়িত্বশীল, তাকেও তার দায়িত্ব সম্বন্ধে জবাবদিহি করতে হবে। মা'কিল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলাল্লাহ (সাঃ) বলেন, **"এমন আমীর যার উপর মুসলিমদের শাসনভার অর্পিত হয় অথচ এরপর সে তাদের কল্যাণ সাধনে চেষ্টা না করে বা তাদের মঙ্গল কামনা না করে; আল্লাহ্ তাকে তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।" (মুসলিম)**

২.২ মৌলিক চাহিদা পূরণে পদক্ষেপসমূহ

মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য খিলাফত সরকার প্রাথমিকভাবে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে:

- **সম্পদের অবাধ প্রবাহ**

  ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রাথমিক উপায় হিসাবে প্রাপ্ত সম্পদের বন্টন ব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়। এক্ষেত্রে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র হুকুম হচ্ছে:

  "যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়।" [সূরা আল-হাশর :৭]

  সুতরাং খিলাফত রাষ্ট্র সম্পদের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করবে।

- **কর্মসংস্থানের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী**

  খিলাফত রাষ্ট্র প্রত্যেক সক্ষম নাগরিকের জন্য এমন একটি পরিবেশ তৈরী করবে যেখানে জীবিকার জন্য জনসাধারণ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে। খিলাফত রাষ্ট্র জনসাধারণের জন্য চাষযোগ্য জমির ব্যবস্থা করবে এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করবে। রাষ্ট্র এমন সব শিল্প স্থাপন করবে যেখানে স্থানীয় দক্ষ জনসাধারণের নিয়োগ দান করা হবে। জনসম্পদ উন্নয়নের জন্য খিলাফত রাষ্ট্র সক্রিয় পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। খিলাফত রাষ্ট্র বিনিয়োগের সুযোগ ও পরিবেশ তৈরী করবে। ফলশ্রুতিতে অনেক কর্মসংস্থান ও সম্পদ সৃষ্টি হবে।

- **পারিবারিক দায়িত্বশীলতা আরোপ**

  খলীফা যখনই জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে কোন নাগরিকের দারিদ্রাবস্থার কথা অবহিত হবেন, তখনই তাঁর নির্বাহী কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাধ্যমে ঐ নাগরিকের দায়িত্ব নিকটাত্মীয়দের কাছে হস্তান্তর করবেন। যদি নিকটাত্মীয়দের পাওয়া না

যায় বা তাদের যথেষ্ট সম্পদ না থাকে তবে খলীফা অভাবী ব্যক্তির মৌলিক চাহিদা পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন ।

- **যাকাত সংগ্রহ ও বন্টন**

খিলাফত সরকার যাকাত সংগ্রহ করে পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত খাত অনুযায়ী বন্টন করবে। ইসলাম আল্লাহ্'র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) দেয়া পবিত্র জীবনব্যবস্থা। সুতরাং ভ্যাট (VAT), ট্যাক্সের মত নিষ্ঠুর ব্যবস্থায় ইসলাম বিশ্বাস করে না। জনগণের উদ্বৃত্ত সম্পদের উপর ইসলামের একটি কর ব্যবস্থা রয়েছে। নিসাবের শর্তপূরণকারী ব্যক্তির অব্যবহৃত সম্পদের যাকাত মুসলমানরা তাদের আকীদা থেকে উৎসারিত ইবাদত মনে করে আদায় করে। এটি এমন একটি কর ব্যবস্থা যা সম্পদকে ধনীদের হাতে কুক্ষিগত করে না রেখে পুরো উম্মাহ্‌র মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া নিশ্চিত করে।

- **খাস জমি বিতরণ, ভূমি সংস্কার ও ভূমি পুনর্বন্টন**

সারাদেশে জরিপ পরিচালনা করে ভূমি সংস্কার ও ভূমি পুনর্বন্টন করা হবে। এই ক্ষেত্রে খিলাফত রাষ্ট্র সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিম্নে লিখিত নিয়ম-কানুনসমূহ বাস্তবায়ন করবে:

ক. খাস জমি হিসেবে চিহ্নিত ভূমি খলীফা ঐ সমস্ত দরিদ্র অভাবী মানুষের মাঝে বিতরণ করবে, যারা এর সঠিক ব্যবহার করতে পারে। যেহেতু খারাজি ভূমির মালিকানা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের, তাই খলীফা একে যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন। আবার জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হওয়াতে এসব ভূমি সঠিক বন্টনের মাধ্যমে জনগণের মৌলিক চাহিদাসমূহ রাষ্ট্র যথাযথভাবে পূরণ করবে।

খ. ভূমি মালিকদের হাতে অব্যবহৃত জমি এবং যা তারা সরাসরি ব্যবহার করে না, সেসব জমি খলীফা তাদের কাছ থেকে নিয়ে নিবেন। কোন জমি যদি তার মালিকের কাছে তিন বছর ধরে অব্যবহৃত পড়ে থাকে, তবে খলীফা সে জমি অধিগ্রহণ করবেন। যারা এই জমি ব্যবহার করতে সক্ষম, খলীফা সেসব দরিদ্র মানুষের কাছে বন্টন করে দিতে পারে। কৃষিভূমির বর্গা দেয়াও ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। মালিককে তার জমি হয় নিজে সরাসরি ব্যবহার করতে হবে অথবা নিজে ব্যবহার করা কিংবা বিক্রি করার যোগ্যতা অর্জন করার আগ পর্যন্ত কাউকে তা ব্যবহার করার অনুমতি দিতে হবে। যদি তিন বছর পর্যন্ত সে এর কোনটিই করতে না পারে, তবে রাষ্ট্র তার কাছ থেকে সেটি নিয়ে নিতে পারে। এ ধরণের নিয়মনীতির বাস্তবায়ন ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

- **উত্তরাধিকারীবিহীন মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ অভাবীদের মাঝে বন্টন**

  উত্তরাধিকারীবিহীন মৃত ব্যক্তির সম্পদ রাষ্ট্রীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং খলীফা ঐ সমস্ত সম্পদের অধিগ্রহণ, ব্যয় ও বরাদ্দের সম্পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করেন। জনগণের মৌলিক অধিকার পূরণের ফরয দায়িত্বের অংশ হিসাবে খলীফা যে কোন অভাবী ব্যক্তিকে তার প্রয়োজন পূরণের জন্য এ সম্পদ দান করতে পারেন।

- **সম্পদশালীদের উপর জরুরী কর আরোপ**

  রাষ্ট্র তার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার পরও যদি সমাজে অভাবী জনগোষ্ঠী অবশিষ্ট থাকে তবে সম্পূর্ণ উম্মাহ'র উপর তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব বর্তায়। বাইতুল মাল-এ যদি রাষ্ট্রের নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণের মত যথেষ্ঠ সম্পদ না থাকে, তবে খলীফা ধনীদের স্বাভাবিক ব্যয় ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে নিয়ে অভাবী মানুষের অভাব পূরণ করবেন।

২.৩ জনগণের নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকার

নিরাপত্তার অধিকার

- খিলাফত ব্যবস্থা দেশের প্রতিটি নাগরিকের তথা মুসলিম-অমুসলিম, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জীবন, সম্পদ, সম্মান ও বিশ্বাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

- ইসলামের দাবি অনুযায়ী সমগ্র দেশে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে যেন দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মানুষ সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তে একাকী ভ্রমণ করতে পারে।

- রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগকে (Sahib ush-Shurtah) প্রয়োজনীয় বাজেট, লোকবল, প্রশিক্ষণ ও আধুনিক উপকরণ দিয়ে শক্তিশালী করা হবে।

বিচার ব্যবস্থার কাঠামো

খলীফা একজন বিশ্বস্ত, যোগ্য (Competent), ও ন্যায়পরায়ন বিচারককে প্রধান বিচারপতি বা কাযী-উল্-কুযাত (Qadhi al Qudhat) নিয়োগ করবেন। প্রধান বিচারপতি বিধি মোতাবেক নিম্নলিখিত বিচারকদের নিয়োগ করবেন:

১. কাযী-উল্-খুসুমাত (Khusoomat) **-** কাযী উল খুসুমাত পারিবারিক আইন, চুক্তি আইন, ক্রিমিনাল আইন ইত্যাদি ব্যাপারে বিচারকার্য পরিচালনা করবেন।

২. কাযী-উল্‌-মুহ্‌তাসিব - কাযী উল মুহ্‌তাসিব ব্যবসা পরিদর্শক, অসামাজিক কার্যকলাপ বিরোধী পরিদর্শক, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য পরিদর্শক তথা জনস্বার্থ দেখাশুনাকারী বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। কাযী-উল্‌-মুহ্‌তাসিবের রায় প্রদান করার জন্য কোন বিচারালয় প্রয়োজন হয় না। তিনি যেকোন সময়ে যেকোন জায়গায় অপরাধ সনাক্ত করতে পারলে সাথে সাথে সেখানেই রায় প্রদান করে তা পুলিশের সাহায্যে বাস্তবায়ন করতে পারেন।

৩. কাযী-উল্‌-মাযালিম - কাযী-উল-মাযালিম খলীফা থেকে শুরু করে শাসকগোষ্ঠীর যেকোন ব্যক্তির যে কোন ধরণের অন্যায় আচরণের ব্যাপারে আইনী কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। তিনি বাদি ছাড়াই নিজে উদ্যোগী হয়ে রাষ্ট্রের যে কোন দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করে বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারেন। খলীফার বিরুদ্ধে মামলা চলাকালীন সময়ে এই আদালতের বিচারককে পদচ্যুত করা যাবেনা।

বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা

পর্যায়ক্রমে কতগুলো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের মাধ্যমে সুস্পষ্ট কিছু মূলনীতি বাস্তবায়ন করে খিলাফত রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থা আইনের শাসন ও বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করবে। খিলাফত রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থার কতগুলো মূলনীতি নিম্নরূপ:

১. সুস্পষ্ট ও ত্রুটিমুক্ত আইন-কানুন
২. নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ স্বাধীন
৩. নিরপেক্ষ বিচার প্রক্রিয়া
৪. বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ
৫. দ্রুত, সহজলভ্য ও দূর্নীতিমুক্ত বিচার ব্যবস্থা

- খিলাফত রাষ্ট্র প্রথম দিন থেকেই শারী'আহ্ অনুযায়ী বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা করে দিবে। যেহেতু খিলাফত রাষ্ট্রে বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন, সেহেতু বিচার বিভাগ জনগণের উপর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

- খিলাফত রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থা হবে নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত। বিচারকের অন্যায়ের ব্যাপারে ইসলাম কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছে। এজন্য বিচারকগণ শারী'আহ্'র প্রত্যেকটি আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবেন এবং পরিপূর্ণ দায়িত্ববোধ থেকে কর্তব্য পালন করবেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"হে ঈমানাদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক; আল্লাহ্'র ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতা অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ্ তাদের শুভাকাঙ্খী তোমাদের চাইতে বেশী। অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত।" [সূরা আন-নিসা : ১৩৫]

- খিলাফত রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থায় দীর্ঘসূত্রিতার কোন অবকাশ থাকবে না। নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট আইন বিদ্যমান থাকায় দ্রুত বিচার কার্যক্রম এই শাসন ব্যবস্থার একটি গতিশীল দিক।

- বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে খিলাফত রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থা রাষ্ট্রের প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি নাগরিকের হাতের নাগালের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হবে। তাকে বিচার প্রাপ্তির জন্য অযথা হয়রানিমূলকভাবে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট স্বীকার করতে হবে না। হযরত ওমর (রা.) মিসরের গভর্ণর আবু মুসা আশ'আরী (রা.) কে লেখা এক চিঠিতে কতগুলো ফরমান দিয়েছিলেন, তার একটি নিম্নরূপ; "লোক সংখ্যা অনুপাতে যথেষ্ট পরিমাণে বিচারালয় ও বিচারকের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে বিচার প্রার্থীগণকে অহেতুক হয়রানি হতে না হয়।"

২.৪ শিক্ষার অধিকার

শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য

ইসলামী ব্যক্তিত্ব তৈরী ও সারাবিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের লক্ষ্যে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করাই হবে খিলাফত ব্যবস্থায় শিক্ষাব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। এটি জাতিকে প্রধানত তিনটি ক্ষেত্রে দক্ষ করে গড়ে তুলবে:

১. প্রত্যেক নাগরিককে সৎ, দক্ষ ও উৎপাদনময় করে গড়ে তুলবে।

২. সামাজিক ক্ষেত্রে ভাল কাজে অংশগ্রহণ ও খারাপ কাজে বাধা প্রদানে দায়িত্বশীল করে গড়ে তুলবে।

৩. জাতিকে শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রযুক্তিগত জ্ঞানে দক্ষ করে তুলবে।

শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে খিলাফত সরকার নিম্নলিখিত বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে:

- ইসলামী আকীদার ভিত্তিতে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হবে। সমগ্র দেশে সবার জন্য একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকবে।

- ব্যক্তির চরিত্র গঠনে ও আদর্শিক ব্যক্তিত্ব তৈরীতে ফলপ্রসূ পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হবে, যাতে শিক্ষার্থীদের মাঝে নীতিবান ব্যক্তিত্ব ও শক্তিশালী নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা তৈরী হয়। শিক্ষা অধিদপ্তরের অনুমোদিত পাঠ্যসূচী ব্যতীত অন্য কোন বিদেশী পাঠ্যসূচী অনুসরণ করা যাবে না।

- খিলাফত রাষ্ট্র নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিককে বিনামূল্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রদান করবে। রাষ্ট্র তার ক্ষমতা অনুযায়ী সবাইকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ প্রদানের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

- প্রাথমিক শিক্ষা সমস্ত জীবনের ভিত্তি। এক্ষেত্রে ইসলামের আদর্শিক আকীদা জোরালোভাবে তুলে ধরা হবে। ফলে জাতির মধ্যে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের আকাঙ্খা গড়ে উঠবে।

- প্রযুক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য উৎপাদনমুখী পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হবে। শুধুমাত্র প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষা নয়, বরং এর গবেষণাকর্ম, উৎপাদন প্রণ্ডিয়া এবং রক্ষণাবেক্ষণও প্রযুক্তিগত শিক্ষার আওতায় আনা হবে। এক্ষেত্রে খিলাফত সরকার দেশে ডাক্তার, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পোদ্যোক্তা, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বিজ্ঞান, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার এমন কি, মহাকাশ বিজ্ঞান, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করবে।

- আমাদের দেশ বিশাল জ্বালানী ও খনিজ সম্পদের অধিকারী হওয়ায় দেশে এবং Petroleum Technology, Coal Mining Technology, Agro-Industry ইত্যাদি বিষয়ে নিজেদের বিশেষজ্ঞ তৈরী করার জন্য খলীফা ব্যবস্থা নিবেন।

- বর্তমান বিশ্বে রাজনৈতিক শক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে সামরিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান অপরিহার্য। এক্ষেত্রে পরমাণু শক্তি গবেষণা, নিজস্ব সামরিক যানবাহন (ট্যাংক, জাহাজ, উড়োজাহাজ) তৈরীর প্রযুক্তি, ভারী শিল্প তৈরীর প্রযুক্তি ইত্যাদি

প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণাধর্মী ও প্রায়োগিক বিজ্ঞান বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরী করার জন্য পর্যাপ্ত পরিকল্পনা নেয়া হবে।

- সকল বিদ্যালয়ে পাঠাগার ও গবেষণাগার তৈরী করা হবে। খলীফা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণাপত্র তৈরীর পৃষ্ঠপোষকতা ও পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করবেন। এক্ষেত্রে পাঠ্যসূচীর বাইরেও বিভিন্ন বই-পুস্তক, পত্রিকা, গবেষণাপত্র ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ পাঠাগার বিভিন্ন এলাকায় বা মসজিদে প্রতিষ্ঠা করা হবে, যেখানে বিনামূল্যে এই সকল বিষয়ে অধ্যয়ন করা যাবে।

২.৫ নারীর অধিকার

আমাদের আজকের সমাজ বিশ্বাস করে লাগামহীন ব্যক্তি স্বাধীনতায়, তাই সমাজে নারীর প্রতি কী দৃষ্টিভঙ্গী হবে তা সমাজের মানুষই নির্ধারণ করে। বর্তমান সমাজের মূল ভিত্তি ব্যক্তির স্বার্থসিদ্ধি হওয়ায় নারী আজ পরিণত হয়েছে মুনাফা হাসিলের উপকরণে। এ সমাজে নারীকে প্রতিনিয়ত উপস্থাপন করা হয় পণ্য তথা যৌনতার প্রতীক হিসাবে। সুতরাং আজকের সমাজে পরুষরা নারীকে এ দৃষ্টিতেই দেখতে অভ্যস্ত হয়। ফলশ্রুতিতে সমাজের প্রতিটি স্তরে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল নারীই হয় নির্যাতিত।

মৌলিক নীতিমালা

- ইসলামী সমাজ নারীকে সমাজে এমনভাবে উপস্থাপন করে যা তাকে সম্মান এবং মর্যাদায় ভূষিত করে। একই সাথে সমাজের সর্বস্তরে তৈরী হয় নারীর প্রতি সম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গী। খিলাফত রাষ্ট্রে নারীর সম্মান রক্ষার দায়িত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের।

- ইসলাম পরপুরুষের সামনে নারীর দৈহিক সৌন্দর্য প্রকাশকে অনুমোদন করে না। এজন্য নারীদের পোষাকের ক্ষেত্রে রয়েছে সুস্পষ্ট বিধান। গৃহের বাইরে বা কর্মক্ষেত্রে নারীকে অবশ্যই এই বিধান মেনে চলতে হবে।

- নারীর দৈহিক সৌন্দর্যকে পুঁজি করে ব্যবসা করা যাবে না। নারীকে এমন সব পেশায় অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হবে না যাতে নারী তার সৌন্দর্য প্রকাশ করতে বাধ্য হয় বা তার সৌন্দর্যকে পুঁজি করা যায়; যেমন মডেলিং, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি।

- নারীকে এমন সব পেশায় অংশগ্রহণ করার অনুমোদন দেয়া হবে যে সমস্ত পেশায় তাকে যোগ্যতা এবং মেধার ভিত্তিতে যাচাই করা হয়। একজন নারী ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, শিক্ষকতা, বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা, ব্যবসা-বাণিজ্য,

সাংবাদিকতা, বিচারকার্যসহ বিভিন্ন পেশায় অংশগ্রহণ করতে পারে। নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী নারী সমাজের বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে সমাজে এবং রাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

- ঘরে এবং বাইরে কাজের প্রয়োজনে নারী-পুরুষের মেলামেশা সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহ্ অনুযায়ী সুস্পষ্ট নীতিমালা অনুমোদন করা হবে। এ নীতিমালার বাইরে নারী-পুরুষের লাগামহীন অবাধ মেলামেশা করার অনুমতি দেয়া হবে না।

নারীর অধিকারসমূহ

- নারীকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে করা বা দেয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। এছাড়াও স্বামী নির্বাচনে নারীর রয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা। বিভিন্ন কারণে একজন নারী তার স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছেদ কামনা করতে পারে।

- নারীর রয়েছে স্বামীর নিকট থেকে ভরণপোষণ পাবার পূর্ণ অধিকার। ইসলামী রাষ্ট্রের আইনানুযায়ী স্ত্রী যত সম্পদশালীই হোক না কেন, তার এবং তার সন্তানের ভরণপোষণের ভার শুধুমাত্র স্বামীর।

- নারীর রয়েছে শিক্ষাদীক্ষা এবং জ্ঞান অর্জনের পূর্ণ অধিকার। নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী সে অনুমোদিত যে কোন শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

- ইসলামের সীমার মধ্যে একজন নারীর রয়েছে স্বাধীনভাবে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের পূর্ণ অধিকার।

- ইসলাম নারীর উত্তরাধিকার প্রাপ্তির পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়েছে। পুরুষদের মতো তারও রয়েছে নিকটাত্মীয়দের সম্পত্তিতে নির্দিষ্ট অধিকার।

- উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ কিংবা নিজের উপার্জিত সম্পদে নারীর রয়েছে পূর্ণ মালিকানা। নিজের উপার্জিত সম্পদ বা প্রাপ্ত সম্পদ সে যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করতে পারে। এ ব্যাপারে তার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। তার মালিকানাভুক্ত সম্পদে তার স্বামী কিংবা বাবারও কোন অধিকার নেই, এমনকি সে তার সম্পদ তার পরিবারের জন্য ব্যয় করতেও বাধ্য নয়।

- ইসলাম নারীকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের অধিকার দিয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর রয়েছে মানুষকে সৎ কাজে আদেশ করা, অসৎ কাজে নিষেধ করা এবং শাসকের ভুল সংশোধনের বা শাসককে

জবাবদিহি করার অধিকার। নারীদের রয়েছে খলীফা নির্বাচিত করার পূর্ণ অধিকার, মজলিশে শুরার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হবার অধিকার।

- ইসলামী সমাজে নারী আল্লাহ্ প্রদত্ত যে কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে তার রয়েছে আইনের সাহায্যে তা আদায় করার অধিকার।

- কোনও মু'মিন নারীর উপর মিথ্যারোপ করা হলে সে আইনের সাহায্যে দোষী ব্যক্তিকে সাজা দেয়ার অধিকার রাখে। ইসলাম যেহেতু নারীকে সম্মানিত হিসাবে গণ্য করে, তাই যে কোনও স্থানে যে কোনও ভাবে তাকে উত্ত্যক্ত করা হলে সে আইনের সাহায্য পাবার অধিকার রাখে।

- যৌতুক প্রথার মূলোৎপাটন করা হবে। কন্যা বা কন্যার বাবার কাছ থেকে কোনও রকম সম্পদ দাবি করার কোন অধিকার ইসলাম পুরুষকে দেয়নি। বরং স্ত্রীর রয়েছে শারী'আহ্ অনুযায়ী মোহরানা পাবার অধিকার। এর অন্যথা হলে ইসলামী রাষ্ট্র অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

২.৬ অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার

ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্ম নয়, বরং এমন একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা যা জীবনের সব বাস্তব সমস্যার সমাধান দেয়। যে কোন সেক্যুলার পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে যেমনি হিন্দু ধর্মসহ বিভিন্ন ধর্মের জনসমষ্টি বসবাস করে তেমনি খিলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেও সব ধর্মের জনসমষ্টি বসবাস করতে পারে। বস্তুতঃ ইসলামের আগমনই হয়েছে মানুষের স্বভাবজাত চাহিদা ও প্রবৃত্তিগুলো পূরণ করা তথা সকলের মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিত করার জন্য। খিলাফত সরকার এক্ষেত্রে মুসলিম, অমুসলিম, উপজাতি ও আদিবাসীর মধ্যে কোন ভেদাভেদ করবেনা। খিলাফত রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের নিম্নলিখিত মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা হবেঃ

- খিলাফত রাষ্ট্র একজন মুসলমানের মতই প্রতিটি অমুসলিম নাগরিকের জীবন, সম্পদ, সম্মান ও বিশ্বাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

- অমুসলিমরা সবসময় নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপন করবে। সকল মুসলমান তাদের সাথে সৎ ও বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশীসুলভ আচরণ করতে বাধ্য থাকবে।

- কোন অমুসলিমকে নিজের ধর্মপালনে বাধা দেয়া হবে না কিংবা জোর করে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে না। প্রত্যেক অমুসলিম নাগরিক সম্পূর্ণ

নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত মনে নিজ নিজ উপসনালয়ে যাতায়াত করবে, কেউ তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারবে না।

- শিক্ষা দান ও গ্রহণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করবে না।

- খিলাফত রাষ্ট্রে বিচার প্রাপ্তির অধিকার সবার জন্য সমান। খলীফা কিংবা তাঁর সরকারের যে কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও মুসলিম-অমুসলিম যে কোন নাগরিক নির্দ্বিধায় বিচার প্রার্থী হতে পারে।

- খিলাফত রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে মজলিসে শুরা। অমুসলিমরাও এ সভার সদস্য হতে পারবে। এই রাজনৈতিক অধিকার লাভের মাধ্যমে তারা নিজেদের দাবী এবং প্রস্তাবসমূহ বিনা বাধায় খিলাফত সরকারের সামনে উপস্থাপন করতে পারবে। এক্ষেত্রে তারা কোন প্রকার রাজনৈতিক হয়রানির শিকার হবে না।

- খিলাফত রাষ্ট্রের নিয়মিত সামরিক বাহিনীতে অমুসলিমরাও সদস্য হতে পারবে। মুসলমানরা তাদের বিশ্বাসকে সমুন্নত রাখতে এবং অমুসলিমরা বেতনভূক্ত কর্মচারীর মর্যাদায় একটি লাভজনক পেশা হিসাবে এ বাহিনীর সদস্য হবে। তেমনিভাবে পুলিশসহ অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতেও অমুসলিমদের অন্তর্ভূক্তিতে কোন বাধা নেই।

২.৭ নাগরিকদের অন্যান্য অধিকার

- প্রতিটি নাগরিকের কাছে বিনামূল্যে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ গ্যাস-পানি-বিদ্যুতের সার্বক্ষণিক সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।

- প্রতিটি নাগরিকের বিনামূল্যে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে। স্বাস্থ্যসেবা জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত হাসপাতাল ও ক্লিনিক তৈরী করা হবে এবং প্রয়োজনীয় ডাক্তার, নার্স, ঔষধ, সরঞ্জাম ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।

- স্বাস্থ্যসেবার সাথে সংশিষ্ট সকল মানব সম্পদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। সরঞ্জাম ও ঔষধ সামগ্রী উৎপাদনে দেশীয় শিল্পকে উৎসাহিত করা হবে।

- শ্রমনীতি ঘোষণা করে শ্রমিকের মজুরি, কর্মস্থলের সুষ্ঠু পরিবেশ, পাওনা ছুটি ইত্যাদি সকল অধিকার নিশ্চিত করা হবে। শ্রমঘন্টা নির্ধারণ করা হবে এবং শ্রমঘন্টা চুরি বন্ধ করা হবে।

- কৃষকের জন্য উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য এবং সুলভে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।

- দেশের অভ্যন্তরে স্থলপথ, আকাশপথ, রেলপথ ও নদীপথের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সাশ্রয়ী, নিরাপদ ও দ্রুত যাতায়াতের উপযোগী করে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হবে। একইভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দেশের উপযোগী ব্যবস্থাকে স্বল্পমূল্যে সকল নাগরিকের হাতের নাগালে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হবে।

- শহরগুলোকে সুষ্ঠু পরিকল্পনার আওতায় আনা হবে। বাড়ী, এ্যাপার্টমেন্ট, বিদ্যালয়, শপিং মল, মসজিদ, রাস্তাঘাট তৈরী, পয়ঃনিস্কাষণ ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ শহরের সার্বিক অবকাঠামো মানুষের বসবাসের উপযোগী ও সুস্থ জীবন যাপনের উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে প্রয়োজনে শহর ও মহানগরগুলোকে ঢেলে সাজানো হবে।

অধ্যায় ৩: স্বনির্ভর অর্থনীতি (Self-Reliant Economy)

একথা অনস্বীকার্য যে বাংলাদেশ অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি দেশ। এদেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ ও সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্য দেশী-বিদেশী অশুভ চ° আজকে মরিয়া হয়ে উঠেছে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির অজুহাত তুলে দুর্নীতিবাজ আমলা ও রাজনীতিবিদ এবং বিদেশী শক্তির আনুকূল্যে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো দেশে পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রসার ঘটিয়ে জনগণের সম্পদ লুট করছে। দেশী-বিদেশী সুবিধাবাদী, সম্পদলোভী চ° এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে খোলা বাজার তত্ত্বের ধোঁকা দিয়ে নিজেদের পকেট ভারী করতে ব্যস্ত। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কিছু লোকের হাতে সম্পদের পাহাড় জমছে আর অন্যদিকে কোটি কোটি মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে।

বিদেশী অর্থনৈতিক সংস্থা বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের মতো সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠানগুলো আজকে দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো সরকার ও বহুজাতিক কোম্পানীগুলোকে দেশের মানুষকে শোষণের পথ উম্মুক্ত করে দিয়েছে। এরাই পুরো দেশের অর্থনীতিকে পাশ্চাত্যের প্রয়োজন ও স্বার্থ লাভের অনুকূলে ঢেলে সাজিয়েছে। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলো প্রায় ধ্বংসের পথে। আর গার্মেন্টস শিল্প ছাড়া উল্লেখ করার মতো তেমন কোন শিল্প গড়ে উঠেনি। আজকে দেশের তেল, গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ সম্পদের উপর বিদেশীদের আধিপত্য বিরাজ করছে। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনে ও দেশের সম্পদ রক্ষার লক্ষ্য নিয়ে খিলাফত সরকার নিম্নলিখিত বিষয়ে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৩.১ শিল্পায়ন

খিলাফত রাষ্ট্র অর্থনীতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে অবশ্যই শিল্পায়নকে গুরুত্ব দিবে এবং নিম্নলিখিত বিষয়ে বাস্তসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে:

- খলীফা স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে শিল্পায়নের জন্য যে ক্ষেত্রগুলো অগ্রাধিকার দিবেন তা হলো ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, গ্যাস ও কয়লা ভিত্তিক শিল্প (যেমন - বিদ্যুৎ, সার ইত্যাদি), মোটর তৈরী শিল্প (ট্রাক্টর, ট্যাংক, জাহাজ, উড়োজাহাজ ইত্যাদি)।

- প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির উৎপাদন, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ – তিনটি পর্যায়েই স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দিকে খিলাফত সরকার গুরুত্ব দিবে।

- বাংলাদেশের শিল্পায়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণ ও ষড়যন্ত্র খিলাফত সরকার শক্ত হাতে প্রতিরোধ করবে। কৌশলগত শিল্প যেমন লৌহ ও ইস্পাত শিল্প কখনোই বিদেশীদের মালিকানাধীনে দেয়া হবে না।

- যেহেতু দেশের ব্যাপক শ্রমবাজার, সুলভ জ্বালানী ও বিশাল পণ্যবাজার শিল্পায়নের জন্য অনুকূল, সেহেতু অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেশের নিজস্ব সম্পদ-নির্ভর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলা হবে এবং শ্রমঘন শিল্পকে উৎসাহিত করা হবে।

- খিলাফত ব্যক্তিমালিকানাধীন পুঁজিকে রাষ্ট্রের পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত করবে এবং প্রধান প্রধান শিল্পপতিদেরকে রাষ্ট্রের সমৃদ্ধির জন্য ঐক্যবদ্ধ করতে সচেষ্ট থাকবে। রাষ্ট্রকে শিল্পোন্নত করতে একটি ফোরাম গড়ে তোলা হবে যারা সুনির্দিষ্টভাবে শিল্পপতিদেরকে নিয়ে কাজ করবে এবং সব সময় তাদেরকে উৎসাহ যোগাবে। ভারী শিল্পের প্রয়োজনে সাপোর্ট ইন্ডাষ্ট্রি গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করার সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় পলিসি থাকবে।

খিলাফত তিনভাবে শিল্পে বিনিয়োগ করবে

- **সরাসরি বিনিয়োগ**

  যে সব শিল্প সাধারণত লাভজনক ভিত্তিতে চালানো সম্ভব নয়, কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশের জন্য অপরিহার্য সেগুলোকে অবশ্যই রাষ্ট্রের নিজস্ব বিনিয়োগে স্থাপন করবে ও চালু রাখবে। যেমন রেলওয়ে, মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র, সাবমেরিন ও যুদ্ধ জাহাজ নির্মান ইত্যাদি।

- **যৌথ বিনিয়োগ**

  যেসব শিল্পের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে রাষ্ট্র তথা জনগণ লাভবান হবে, অথবা যেসব শিল্প সরকারের অংশগ্রহণ ছাড়া গড়ে উঠতে পারবে না, যেমন খনিজ সম্পদ উত্তোলন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ইত্যাদিতে রাষ্ট্র ব্যক্তিখাতের সাথে যৌথ বিনিয়োগ করবে।

- **ব্যক্তিখাতের শিল্পে ভর্তুকি বা সুবিধা প্রদান**

  যারা রাষ্ট্রের চাহিদা মতো পণ্য উৎপাদন করবে, যেমন কোন গাড়ি কারখানা যদি সামরিক যান বা ট্যাঙ্ক উৎপাদন করে তবে তাকে যথাযথ আর্থিক সুবিধা দেয়া হবে। যারা অন্যান্য শিল্পের জন্য কাঁচামাল উৎপাদন করে তাদেরকে প্রয়োজনে ভর্তুকি বা ঋণ সুবিধা দেয়া হবে। রাষ্ট্রের অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ শিল্প (যেমন লোহা, কেমিক্যাল, অস্ত্র কারখানা

ইত্যাদি) স্থাপনকারীদেরকে দরকার হলে বিনামূল্যে সরকারী জমি বরাদ্দ, কর রেয়াত ও ঋণ প্রদানসহ বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করা হবে।

৩.২ জ্বালানী সম্পদ ব্যবস্থাপনা

জ্বালানী সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দেশকে একটি শক্তিশালী আত্মনির্ভরশীল দেশে পরিণত করার কোন ভিশন, পরিকল্পনা বা সংকল্প বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক দলের নেই। অথচ এদেশে আছে প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা-তেল-ইউরেনিয়াম ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ। আমাদের শুধু দরকার প্রজ্ঞাবান, বিচক্ষণ, সুদূরপ্রসারী চিন্তা ও পরিকল্পনাকারী নেতৃত্ব; যে নেতৃত্বের থাকবে ভবিষ্যতের রূপকল্প (Vision) এবং দৃঢ়সংকল্প; যে নেতৃত্ব সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিয়ে জাতিকে সামনে এগিয়ে নিবে। তাদের ভিশন হবে জনগণকে সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দেশকে আত্মনির্ভরশীল, উন্নত ও শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করা। জ্বালানী খাতের উন্নয়ন তাই সবদিক থেকেই খিলাফত রাষ্ট্রের অগ্রাধিকার তালিকায় থাকবে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে খিলাফত সরকার নিম্নলিখিত বিষয়ে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে:

- জ্বালানী সম্পদ কখনোই বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়া হবে না কিংবা কোন ব্যক্তি বা বিদেশী কোম্পানীর মালিকানাধীনে দেয়া হবে না। রাসূলুলাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেন,

  “তিনটি জিনিষের মাঝে সকল মানুষ শরীক। এগুলো হচ্ছে পানি, চারণ ভূমি এবং আগুন।”

  জ্বালানী সম্পদের মালিকানা সংণান্ত ইসলামের ধারণা উপরোক্ত হাদীস থেকে উৎসারিত। হাদীসে বর্ণিত আগুন এর অন্যতম অর্থ জ্বালানী। সুতরাং, জ্বালানী সম্পদের উৎস কখনোই ব্যক্তি মালিকানাধীন হতে পারে না। সমগ্র দেশবাসীর স্বাভাবিক জ্বালাানী চাহিদা রয়েছে। তাই জ্বালানী গণমালিকানাধীন সম্পদ অর্থাৎ জ্বালানী সম্পদের উপর সমগ্র দেশবাসীর অধিকার রয়েছে। দেশবাসীর পক্ষ থেকে এই সম্পদের ব্যবস্থাপনার ভার খলীফার উপর ন্যস্ত।

- খিলাফত সরকার জ্বালানী নিরাপত্তা নীতি নির্ধারণ করে একটি শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। খিলাফত রাষ্ট্র শুধু বর্তমান চাহিদা নয়, ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণও নিশ্চিত করবে এবং জ্বালানী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অন্যান্য রাষ্ট্রের জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে। জ্বালানী সুবিধা জনগণের হাতের নাগালে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সর্বশক্তি নিয়োগ করবে।

- খিলাফত রাষ্ট্র জ্বালানী সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি বা দক্ষ জনশক্তির জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল হবে না। নিজস্ব প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি ও দক্ষ জনশক্তি তৈরীর জন্য খিলাফত সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। জ্বালানী সম্পদ খনন, উত্তোলন, পরিশোধন ও বিতরণের প্রযুক্তি গড়ে তুলবে এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

- বিদেশী জ্বালানী কোম্পানীসমূহের সাথে যে সমস্ত অযৌক্তিক বা মুসলিমদের স্বার্থবিরোধী চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে সেগুলো তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করবে।

৩.৩ কৃষি

খাদ্যে বাংলাদেশ প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। এছাড়া চিনি, পাট, মৎস্য, চা ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলো অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। খিলাফত রাষ্ট্র জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং বৃহত্তর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হিসাবে কৃষিকে অগ্রাধিকার দিবে। কৃষিকে অর্থনীতির মেরুদন্ড ধরে কৃষি নীতি ঘোষণা করা হবে ও কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে তুলা হবে।

কিভাবে খিলাফত সরকার কৃষিখাতে ব্যাপক উন্নয়ন নিশ্চিত করেছিল তার একটি উদাহরণ হচ্ছে আব্বাসীয় খিলাফত। দামেস্কের পরিবর্তে বাগদাদকে খিলাফতের রাজধানী হিসেবে গ্রহণ করার পর তারা কৃষি উন্নয়নে মনোযোগ দেয়। প্রথমে তারা টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী শাসন নিশ্চিত করে। এরপর তারা এই দুই নদীর মধ্যে অসংখ্য সংযোগ খাল কেটে পুরো এলাকার কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লবের সৃষ্টি করে। তারা খাল, বিল, পুকুর ইত্যাদির পাশাপাশি ভূ-গর্ভস্থ পানির চ্যানেলগুলোকে সংযুক্ত করে, ফলে বিশাল এলাকায় পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়। আব্বাসীয় খিলাফতের আমলে ব্যাপক আর্থিক উন্নতির অন্যতম কারণ ছিল কৃষি উৎপাদন থেকে সরকারী আয় এবং কৃষিনির্ভর অর্থনীতির ব্যাপক প্রসার। একটি শক্ত ভিত্তির উপর অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হবার পর স্বাভাবিকভাবে তাঁতশিল্প, চামড়াশিল্প, ধাতবশিল্প ইত্যাদি তখনকার সময়ের ভারী শিল্পের প্রসার ঘটতে থাকে এবং এক দশকের মধ্যে বাগদাদ তৎকালীন সময়ে জানা পৃথিবীতে কনস্টান্টিনোপলের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরীতে পরিণত হয়।

খিলাফত রাষ্ট্র কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে মনোযোগ দিবে। এক্ষেত্রে খিলাফত সরকার যে পদক্ষেপগুলো নিবে তা নিম্নরূপ:

- **খাস জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন**

  খলীফা খাস জমি হিসেবে চিহ্নিত ভূমি ভূমিহীন কৃষক, নদী ভাঙ্গনে সর্বহারা মানুষ ও দরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করবে। যেহেতু

খারাজি ভূমির মালিকানা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের, তাই খলীফা একে যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন।

- **অব্যবহৃত জমি পুনর্বন্টন**

খিলাফত সরকার চাষযোগ্য জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যক্তি মালিকানাধীন অব্যবহৃত জমির বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখবে। বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতা হচ্ছে অনেক জমির মালিক নিজেরা নিজেদের জমি ব্যবহার করেন না, অন্যের কাছে 'বর্গা' দেন বা ফেলে রাখেন। জমি ধরে রাখার এই পদ্ধতি ইসলাম অনুমোদন করে না। মালিককে তার জমি হয় নিজে সরাসরি ব্যবহার করতে হবে অথবা নিজে ব্যবহার করা কিংবা বি◌ি করার যোগ্যতা অর্জন করার আগ পর্যন্ত কাউকে তা ব্যবহার করার অনুমতি দিতে হবে। কেউ যদি নিজ জমি এক নাগাড়ে তিন বছর চাষ না করে, তাহলে খিলাফত সরকার তার জমি এমন কাউকে দিয়ে দেবে যে তা ব্যবহার করতে সক্ষম। ভূমি সংস্কার ও পুনর্বন্টন খিলাফত সরকারের একটি চলমান প্র◌িয়া, যার ফলে সর্বোচ্চ পরিমাণ জমির আবাদ বা ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

- **সেচের পানি প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ**

এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। আর খিলাফত সরকারও আয়ের জন্য কৃষিখাতের উপর নির্ভরশীল। কৃষিজ জমি যদি প্রাকৃতিকভাবে সেচের পানি পায় তবে সরকার উৎপাদিত ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ পাবে। আর যদি সরকার প্রয়োজনীয় পানির ব্যবস্থা করে, তবে সরকার উৎপাদিত ফসলের আরও অধিক অংশ পাবে। অর্থাৎ সেচের পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য খিলাফত সরকার স্বাভাবিকভাবেই উৎসাহী হবে।

- **সার, ডিজেল ও বিদ্যুৎ**

কৃষি উৎপাদনে এই তিনটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ। এগুলোর উৎপাদন নির্ভর করে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর যা গণমানুষের অধিকার হিসেবে ইসলামে স্বীকৃত। রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

"মানুষ তিনটি বিষয়ে শরিক। পানি, বিস্তীর্ণ চারণভূমি ও আগুন।"

জনগণের দোরগোড়ায় ডিজেল ও বিদ্যুত সরবরাহ করা খিলাফত সরকারের দায়িত্ব এবং এগুলো পাওয়া জনগণের অধিকার। একই কথা সারের জন্যও প্রযোজ্য, কারণ সার প্রাকৃতিক গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ উপাদান থেকে তৈরী

করা হয়। এক্ষেত্রেও শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক ডিলার নিয়োগ করে সরকার দায়িত্ব এড়াতে পারবে না।

- **উচ্চ ফলনশীন বীজ**

পেটেন্ট এর নামে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোকে বীজের মালিকানা-নির্ভর ব্যবসা ইসলাম অনুমোদন করে না। ফলে উচ্চ ফলনশীন ধানের বীজ সকলের কাছে সহজলভ্য হবে এবং সামগ্রিকভাবে দেশে কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

- **প্রযুক্তি**

খিলাফত সরকার জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কৃষি পদ্ধতি ও প্রযুক্তির আধুনিকায়ন করবে এবং তা কৃষকদের হাতে তুলে দিবে। কৃষিতে প্রয়োজনীয় ভারী যন্ত্রসমূহ আমদানী না করে সেগুলোকে দেশে তৈরী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। খিলাফত রাষ্ট্র কোন মধ্যযুগীয় যাজকতন্ত্র (theocratic state) নয় যা সমাজে নতুন নতুন জিনিসের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের প্রণ্যি়া বন্ধ করে দেয়। বরং খিলাফত সরকার সর্বোত্তম উৎপাদনের লক্ষ্যে কাজ করবে এবং কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহার করবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন,

“তিনিই সে সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমিনে রয়েছে সেই সমস্ত।” [সূরা বাকারা : ২৯]

খিলাফতের শাসনকালে কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। যেমন সেচের ক্ষেত্রে বাঁধ, জলাধার, পানির কল ইত্যাদি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শুষ্ক আরব মরুভূমি ফসলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কৃষি বিজ্ঞানীরা চাষাবাদের জন্য এমন ম্যানুয়াল (দিক-নির্দেশনা/পরিকল্পনা) তৈরি করেছিলেন যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে কখন কোন জমিতে কিভাবে চাষাবাদ করলে এবং ফসলের যত্ন নিলে সর্বোত্তম উৎপাদন সম্ভব। ইবনে আল বাইতার এর মত বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন প্রজাতির শস্য, গবাদি পশু ইত্যাদি পরিচিত করে তুলেছিলেন।

- **অনুদান ও সুদমুক্ত ঋণ**

খিলাফত সরকার গরিব কৃষকদেরকে অনুদান বা সুদমুক্ত ঋণ দিবে, যাতে করে তারা জমির যথাযথ ব্যবহার করতে পারে। এছাড়াও দেশের খনিজ সম্পদ বিশেষ করে তেল, গ্যাস, কয়লা ইত্যাদি জ্বালানী সম্পদ উত্তোলন ও জনগণের মধ্যে এর সুবিধা বিতরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে খিলাফত সরকার। এর ফলে উৎপাদন খরচ কমে আসবে এবং সামগ্রিকভাবে দেশের জনগণ উপকৃত হবে।

৩.৪ অর্থ ব্যবস্থাপনা

- **খিলাফত রাষ্ট্রের মুদ্রানীতি**

  খিলাফত সরকার দেশের অভ্যন্তরে সকল প্রকার বিনিময় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বর্ণ ও রোপ্যভিত্তিক দ্বি-ধাতব মুদ্রা ব্যবস্থাপনা (Bi-Metallic Standard) চালু করবে। ইসলাম সরকারকে ইচ্ছামত টাকা ছাপানোর অনুমোদন দেয়না। ফলে সরকারের হাতে মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ তথা ইচ্ছামত সংকোচন ও সম্প্রসারণের নীতি অনুসরণের কোন হাতিয়ার নেই। ইসলাম টাকা ছাপানোর সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় নিয়ম প্রদান করেছে আর তা হলো স্বর্ণ ও রৌপ্যভিত্তিক মুদ্রা ব্যবস্থা। স্বর্ণ ও রূপার উভয়ই নিজস্ব মূল্য রয়েছে, যা বর্তমানে প্রচলিত মুদ্রার নেই। যেহেতু স্বর্ণ ও রৌপ্যভিত্তিক মুদ্রা ব্যবস্থায় সরকার নিজের ইচ্ছামত মুদ্রা সরবরাহ করতে পারেনা, তাই মৌলিকভাবে এই মুদ্রা ব্যবস্থা স্থিতিশীল। এটি শুধু তত্ত্বকথা নয়, ইতিহাসের বাস্তবতা। যেখানে প্রতি বছর আমাদের দেশে ৫-১০ শতাংশ করে মূল্যস্ফীতি ঘটছে, সেখানে উসমানী খিলাফতের একটি সুদীর্ঘ সময়, আশি বছরেরও অধিক সময়ের মধ্যে মূল্যস্ফীতি ঘটেছে মাত্র ৭ শতাংশ।

- **কর ব্যবস্থা ইত্যাদি**

  খিলাফত সরকার আয়ের উৎস হিসাবে ব্যক্তি আয়ের উপর কর, মূল্য সংযোজন কর ইত্যাদি জালেম ব্যবস্থা বাতিল করে তার পরিবর্তে যাকাত, উশর, খারাজ, জাতীয় সম্পদ থেকে আয় ইত্যাদি জাতীয় আয়ের উৎস বানাবে। ব্যয়ের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার দিবে মানুষের মৌলিক অধিকার প্রদানের বিষয়গুলোর প্রতি। প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হবার পরই শুধুমাত্র অন্যান্য বিষয়ে দৃষ্টি দিবে।

  বর্তমান পুঁজিবাদী কোম্পানী কাঠামোর পরিবর্তে ইসলামী কোম্পানী আইন প্রবর্তন করা হবে। সকল প্রকার সুদভিত্তিক কার্যক্রম, প্রতিষ্ঠান ও Regulatory body নিষিদ্ধ করবে। স্টক এক্সচেঞ্জসহ সকল speculative অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করবে।

৩.৫ বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত অর্থনীতি

- খিলাফত রাষ্ট্র আমাদের অর্থনীতিতে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠানের যে কোন ধরণের খবরদারী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করবে।

- সকল প্রকার ইসলাম বিরোধী অসম বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক চুক্তি বাতিল করবে।

- কৌশলগত সম্পদ জাতীয় নিরাপত্ত্বার সাথে সংশিষ্ট। খিলাফত সরকার নদী বন্দর, সমুদ্র বন্দর, বিমান বন্দর নিয়ে ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থ বিরোধী চুক্তি বাতিল করবে।

- চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের উপর থেকে সকল বিদেশী হস্তক্ষেপ নির্মূল করা হবে। খিলাফত সরকার কোনংমেই এই বন্দরগুলো বেসরকারীকরণ করা বা বিদেশীদের হাতে তুলে দেবে না।

অধ্যায় ৪: পররাষ্ট্র নীতি ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা (Foreign Policy and Security of the State)

৪.১ মূলনীতি

বাংলাদেশের বর্তমানে ঘোষিত পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে “সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বৈরিতা নয়”। চারদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায় এই পররাষ্ট্রনীতি নিতান্তই হাস্যকর। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত বিগত কয়েক দশক যাবত একের পর এক ইস্যু তৈরী করে বাংলাদেশের উপর চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে। এদেশের শাসকগোষ্ঠী ভারত ছাড়াও মার্কিন-ইইউ-ইহুদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সামনে সকল ক্ষেত্রে ও সব সময় নতজানু নীতি অবলম্বন করে এসেছে। সুতরাং একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাংলাদেশের ঘোষিত পররাষ্ট্রনীতি দেশের শাসকগোষ্ঠীর দুর্বলতার পরিচয় বহন করে মাত্র।

সমগ্র পৃথিবী ও মানবজাতির সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সুস্পষ্টভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি ও প্রতিরক্ষানীতি সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহ্ এ আলোকপাত করেছেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন :

(১) “... এবং কিছুতেই আল্লাহ্ কাফেরদেরকে মুসলমানদের উপর বিজয় দান করবেন না।” [সূরা নিসা : ১৪১]

(২) “তিনিই তার রাসূলকে প্রেরণ করেছেন পথ নির্দেশ ও সত্য ধর্ম সহকারে, যাতে একে সকল জীবনব্যবস্থার উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরেকরা তা অপছন্দ করে।” [সূরা আছ্-ছফ : ৯]

(৩) “হে মু’মিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধু ... ।” [সূরা মায়েদা : ৫১]

(৪) “তোমরাই হলে সর্বোত্তম জাতি, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে ... ।” [সূরা আলি ইমরান : ১১০]

(৫) “ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন ... ।” [সূরা বাকারা : ১২০]

(৬) “আপনি মানবজাতির মধ্যে ইহুদী ও মুশরেকদেরকে মুসলমানদের অধিক শত্রু হিসেবে পাবেন... ।” [সূরা মায়েদা : ৮২]

উপরোক্ত আয়াতসহ অসংখ্য আয়াত ও রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ্ থেকে এটা স্পষ্ট যে ইসলামী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি হবে ইসলামের বাণী ও ন্যায়বিচার পৃথিবীতে

অন্যান্য জাতির সামনে তুলে ধরার নীতিকে কেন্দ্র করে। আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র হবার কারণে খিলাফত সরকারের থাকবে একটি শক্তিশালী নেতৃত্ব ও দূরদর্শী চিন্তা (Vision)। খিলাফত সরকার পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসাবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিবে।

খিলাফত রাষ্ট্র মুসলিম বিশ্বকে একীভূত করবে যাতে মানবসম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভৌগোলিক অবস্থানের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে। ঐক্যবদ্ধ মুসলিম বিশ্ব তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং উদীয়মান শক্তি ভারত, চীন ও রাশিয়ার সাথে সফলভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে।

ইসলামী রাষ্ট্র কখনোই অন্যের আধিপত্য মেনে নেবে না। খিলাফত সরকার সকল ক্ষেত্রে মার্কিন-ভারত-বৃটেন-ইসরাইলের তাঁবেদারি বন্ধ করবে এবং বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ কঠোরভাবে প্রতিহত করবে। ভারতের সীমান্ত আগ্রাসন শক্তভাবে মোকাবেলা করবে এবং তালপট্টি, পানি আগ্রাসন ইত্যাদি সকল ইস্যুতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। মার্কিন-ভারত-বৃটেন-ইসরাইল তথা কোন শত্রু রাষ্ট্রের সাথে যে সমস্ত অযৌক্তিক ও তাঁবেদারি চুক্তি বা ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থবিরোধী চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে সেগুলো তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করবে।

৪.২ সশস্ত্রবাহিনীর শক্তিশালীকরণ

খিলাফত সরকার নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবিলায় সশস্ত্রবাহিনীকে সার্বিকভাবে সদা প্রস্তুত রাখবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন,

"আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন ভীতির সৃষ্টি হয় আল্লাহ্'র শত্রুদের মধ্যে এবং তোমাদের শত্রুদের মধ্যে আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যেও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ্ তাদেরকে চেনেন..." [সূরা আনফাল : ৬০]

এজন্য–

- খিলাফত সরকার সশস্ত্রবাহিনীকে দূরদর্শী চিন্তা তথা ইসলামের বিজয়ী পতাকা উড়ানোর উচ্চাশার (vision) অধিকারী করবে।

- খিলাফত সরকার সশস্ত্রবাহিনীকে শক্তিশালী ও আধুনিকায়ন করবে। সরকার সশস্ত্রবাহিনীকে প্রয়োজনীয় বাজেট, সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সকল বহিঃশত্রুর আগ্রাসনের মোকাবেলার জন্য যথাযথ প্রস্তুত রাখবে।

- প্রতিরক্ষা বাজেট হবে নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে; সামগ্রিক বাজেটের অথবা জিডিপির নির্দিষ্ট কোন শতাংশ অথবা অন্য কোন দেশের সাথে কোন প্রকার তুলনার উপর ভিত্তি করে নয়।

৪.৩ প্রতিরক্ষা শিল্পকেন্দ্রিক অর্থনীতি:

খিলাফতের অর্থনীতি হবে প্রতিরক্ষা শিল্পকেন্দ্রিক অর্থনীতি। উন্নত প্রতিরক্ষা কাঠামো গড়ে তোলা ও তার ক্রমাগত প্রবৃদ্ধি ও আধুনিকায়নই হবে অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। এধরণের অর্থনীতি বৈরী পরাশক্তিগুলোর আগ্রাসী পরিকল্পনা থেকে খিলাফতকে রক্ষা করবে।

প্রতিরক্ষা কেন্দ্রিক অর্থনীতির অপরিহার্য করণীয় হলো সমরাস্ত্র তৈরীর কারখানার পাশাপাশি সহায়ক শিল্প হিসেবে স্টীল, লোহা, কয়লা, যানবাহন নির্মাণ, খনিজ উত্তোলন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি শিল্প গড়ে তোলা। খিলাফত সরকার রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য সহায়ক বৃহৎ শিল্প স্থাপনকারীদেরকে উৎসাহ যোগাবে এবং এক্ষেত্রে তাদেরকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করার সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় নীতি থাকবে।

৪.৪ প্রযুক্তি

খিলাফত সরকার প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও সরঞ্জামের ক্ষেত্রে বিদেশী নির্ভরশীলতা কমিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। নিরাপত্তার স্বার্থে ও শক্তির ভারসাম্য (Balance of Power) বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি সংগ্রহ ও উদ্ভাবনের ব্যবস্থা করবে। পারমাণবিক শক্তি, সাবমেরিন, অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান ইত্যাদি যে প্রযুক্তির মাধ্যমে শক্তির ভারসাম্য অর্জন করতে পারবে, দীর্ঘমেয়াদে খিলাফত সরকার তাই করবে।

৪.৫ সিটিজেন'স আর্মি

খিলাফত সরকার বর্তমান সামরিক-বেসামরিক নিবিড় সম্পর্ককে আরো এগিয়ে নিয়ে সাধারণ জনগণকে দেশের প্রতিরক্ষায় আরো গভীরভাবে সম্পৃক্ত করবে। এই সম্পৃক্ততার ধরণ হবে নিম্নরূপ:

- সমগ্র জনগণকে প্রাথমিকভাবে জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রু-মিত্র সম্পর্কে জনগণকে পরিষ্কার ধারণা দেয়া।

- ১৫ বছরের উর্ধ্বে দেশের প্রত্যেক তরুণকে বাধ্যতামূলক মৌলিক সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া।

- যারা স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে গেছেন, তাদের মধ্যে যারা এখনো চল্লিশ বছর অতি্ম করেননি, তাদেরকে পর্যায়্মে সামরিক প্রশিক্ষণের আওতায় আনা। উকবা ইব্‌ন আমের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে মিম্বারের উপর আসীন অবস্থায় আমি বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী *'এবং তোমরা তাদের মোকাবেলায় শক্তি সঞ্চয় করে রাখো।'* **"জেনে রাখো, শক্তি হচ্ছে তীরন্দাযী, জেনে রাখো, শক্তি হচ্ছে তীরন্দাযী, জেনে রাখো, শক্তি হচ্ছে তীরন্দাযী।"** (মুসলিম শরীফ) এখানে খিলাফত রাষ্ট্রের প্রতিটি সক্ষম নাগরিককে সামরিক প্রশিক্ষণের কথা বলা হয়েছে।

৪.৬ কূটনৈতিক তৎপরতা

খিলাফত সরকার বহিঃর্বিশ্বে বন্ধু সন্ধানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। খিলাফত সরকার আমাদের কূটনীতিবিদদের আন্ৰর্জাতিক ক্ষেত্রে দরকষাকষির জন্য (Negotiation) প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। এক্ষেত্রে হুদায়বিয়ার সন্ধির উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। কুরাইশদের সাথে ব্যাপক দরকষাকষির পর স্বাক্ষরিত এই চুক্তির মাধ্যমে রাসূল (সাঃ) সুস্পষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জন করেছিলেন – চুক্তিটির ফলে সমগ্র আরব বিশ্বে এবং বিশেষ করে কুরাইশদেও মধ্যে ইসলামের পক্ষে জনমত তৈরী হয়েছিল। এছাড়াও এই চুক্তির ফলে খিলাফত রাষ্ট্র কর্তৃক খাইবার বিজয়, এমনকি মক্কা বিজয়ের পথও সুগম হয়েছিলো। কুরাইশদের সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আরব উপদ্বীপে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়েছিলো। শুধু তাই নয়, রাসূল (সাঃ) এই সময়ে আরবের বাইরেও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

৪.৭ আন্তর্জাতিক চুক্তি

ইসলামী শারী'আহ্ আন্ৰর্জাতিক চুক্তিসমূহকে বিশেষ ধরণের চুক্তি হিসেবে বিবেচনা করে। কারণ এগুলো দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের কিছু বিষয়কে কেন্দ্র করে সম্পাদিত চুক্তি বা সমঝোতা। তাই চুক্তি সম্পাদনের মৌলিক বিধিমালাগুলো আন্ৰর্জাতিক চুক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বৈধ হিসেবে গণ্য হবার জন্য চুক্তিগুলোকে শারী'আহ্র কিছু আইনের শর্ত পূরণ করতে হবে।

- চুক্তিটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হতে হবে। চুক্তিটি যেন অবশ্যই ইসলামকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যদি কোন চুক্তি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির কোন উদ্দেশ্য হাসিলে সহায়ক না হয়, তবে সে চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

- চুক্তির বিষয়বস্তু বৈধ হতে হবে এবং চুক্তির মধ্যে কোন অবৈধ শর্ত থাকতে পারবে না। রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

“মুসলিম চুক্তির শর্ত মেনে চলবে যদি না চুক্তিতে এমন শর্ত থাকে যা বৈধ বিষয়কে অবৈধ করে বা অবৈধ বিষয়কে বৈধ করে।” [তিরমিজী]

- যে কোন চুক্তির সুনির্দিষ্ট মেয়াদ থাকতে হবে। স্থায়ী বা আধাস্থায়ী চুক্তি (অনেক দীর্ঘ সময়, যেমন ৯৯ বছরের চুক্তি) ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম।

- যে চুক্তি মুসলিমদের নতজানু করে রাখে, যে চুক্তি মুসলিমদের কাফেরদের অধীনস্থ করার হাতিয়ার, ইসলামী ভূখন্ডে কাফেরদের সার্বভৌমত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করে এবং মুসলিমদের উপর ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান করে, সে সব চুক্তি ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ (হারাম)। কারণ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন,

  “... এবং কিছুতেই আল্লাহ্ কাফেরদেরকে মুসলমানদের উপর বিজয় দান করবেন না।” [সূরা আন্-নিসা : ১৪১]

- কোন কুফর রাষ্ট্রের সাথে সামরিক জোট গঠন করা ইসলামী শারী'আহ্-এর দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ। যেমন যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি, দ্বিপাক্ষিক নিরাপত্তা চুক্তি, যৌথ সামরিক মহড়া এবং বিভিন্ন ধরণের সামরিক সহযোগিতা ইত্যাদি। এমনিভাবে কাফেরদেরকে সামরিক ঘাঁটি ব্যবহার করতে দেয়া, বিমান বন্দর, নৌবন্দর ইত্যাদি দিয়ে দেয়া ইসলামী নীতিতে হারাম। কারণ মুসলমানদের জন্য কাফেরদের পতাকাতলে লড়াই করা, কুফরী পথে লড়াই করা, কুফর রাষ্ট্র রক্ষার জন্য লড়াই করা এবং কাফের সেনাবাহিনীকে মুসলিম জনগণ বা ইসলামী ভূমির নিয়ন্ত্রণ প্রদান করা হারাম।

- মার্কিন-ভারত-বৃটেন-ইসরাইল তথা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত রাষ্ট্রের সাথে কোন চুক্তি হতে পারে না, যদি না তা হয় যুদ্ধবিরতি চুক্তি। যুদ্ধবিরতি চুক্তির বাস্ৱবায়ন হলে তবেই সে রাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য চুক্তি করা যেতে পারে।

- মার্কিন-ভারত-বৃটেন-ইসরাইল তথা মুসলিমদের শত্রু রাষ্ট্রসমূহ ব্যাতীত অন্যান্য অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে ব্যবসা, অর্থনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ে চুক্তি করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এসব চুক্তি মুসলমানদের স্বার্থের অনুকূলে হয় ও এর দ্বারা মুসলমানদের প্রয়োজন পূরণ হয়। তবে ঐ সব রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধি পায় এমন শর্তের ভিত্তিতে কোন চুক্তি করা যাবে না।